ইসলামে বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি ঃ একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ ওমর ফারুক*
মোহাম্মদ জাকির হোসাইন**

সার-সংক্ষেপঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিকভাবে জীবন ধারনের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা থেকে আসে পরস্পর সহযোগিতা ও সহাবস্থানের বিষয়। ফলে সমগ্র মানব মন্ডলী বৃহত্তর অর্থে একটি সমাজে বসবাস করছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সে সমাজেরই একটা অংশ মাত্র। এই সামাজিক ব্যবস্থাকে সুন্দর ভাবে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের । এক্ষেত্রে বিশেষতঃ বিচার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুবিচার যে কোন সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব শর্ত । সুবিচার ছাড়া মানবাধিকার প্রহসনে পরিণত হয়। সুবিচারের জন্য আবার নিরপেক্ষ, সুষম আইন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা অপরিহার্য। মানব রচিত আইনে এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রায়োগিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক আদালত বা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা আল্লাহ প্রদত্ত, তাই এটা সন্দেহাতীতভাবে নিরপেক্ষ, সুষম ও সুবিচারপূর্ণ। এর প্রায়োগিক ব্যবস্থা নৈতিকতার (যেটাকে ইসলামের পরিভাষায় ঈমান, আমল ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস বলা হয়) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই এর প্রায়োগিক সুষ্ঠুতাও প্রশ্নাতীত। ইসলামী আইন ও বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষনাঃ'বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।'[১] [সুরা ইউসুফঃ৪০] কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ না জেনে মিথ্যা প্রচারনা চালাচ্ছে যে, ইসলাম প্রবর্তিত আইন হচ্ছে বর্বর, নির্দয়, কঠোর ও অমানবিক। অথচ ইসলাম প্রবর্তিত আইন ও বিচার ব্যবস্থাই দিতে পারে সকল মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঠিক করে দিতে পারেন মানুষের জীবনের সার্বিক মুলনীতি। আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও মহানবীর সা. সুন্নাহতে বর্ণিত সু-সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার ব্যবস্থাই দিতে পারে সঠিক বিচারের গ্যারান্টি। আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মহানবী সা. সকল বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থায় আদর্শকেও মানব জাতির সামনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। সেটা যেমন নিঁখুত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বশ্রেনীর মানুষের জন্য কল্যাণকর তেমনি স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, মানুষের সাথে মানুষের, ইহকালের সাথে পরকালের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে সামঞ্জস্যশীল ও গভীর তাৎপর্যে পরম মহিমান্বিত করে তোলে।

Abstract

Man is a social being by nature. He cannot live perpetually on his own completely independent of others. People are interdependent. Consequently, friction arises between them when their personal interests come into conflict with each other, or when what they perceive as their individual rights infringe upon those of others. Conflicts between them inevitably break out. In some cases, one party to the conflict might be strong and aggressive while the other is weak and condescending, incapable of defending his rights. Because of this, it becomes necessary for there to be a way to prevent people from oppressing one another, to ensure that the weaker members of society receive justice, and to determine right from wrong when issues get complicated or uncertain. This can only be realized through a judge that has the power to give legal verdicts in cases of dispute. For this reason, we find that the existence of a judge is considered by Islamic law and the

---

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** সিনিয়র লেকচারার, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনির্ভাসিটি অব বাংলাদেশ

laws of all the other revealed religions to be both a religious obligation and a necessity of human life. The Islamic Laws that confirmed the will of God can ensure justice for humanity, which is absolutely impossible by secular and man made law. Allah says: The command (or the judgment) is for none but Allah" (Quranul Karim, Sura Yousuf,12:40)

There have been some propaganda by the western society that punishment in Islamic penal code is one kind of cruelty for humanity, such comment to made because of there ignorance about Islamic Law. Islam–the religion that God wants for mankind from the time that HE sent Muhammad, may the mercy and blessings of God be upon him until the Day of Judgment –shows great concern for the judicial system and those appointed to carry out its responsibilities. Islam prescribes for it many legal injunctions. How else could it be, when Islam is the religion of mercy, equality, and justice? It is the religion that comes to free people from worshipping Creation and bring them to the worship of God. It is the religion that comes to remove people from oppression and inequity and bring them to the highest degree of justice and freedom.

ভূমিকাঃ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন, ইসলাম কী? ইসলাম একটি আরবী শব্দ। আরবী 'সালমুন' থেকে এর উৎপত্তি। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। বস্তুত ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা একটি পূর্ণাংগ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম। মহাগ্রন্থ আল কুরআন-এ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, "ইসলাম আল্লাহের নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন"।[২] সাধারণত ধর্ম বলতে যা বুঝানো হয়; কিছু উপদেশবাক্য বা আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি, সে অর্থে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, (Complete code of life) দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে ব্যাপারে ইসলাম কোন বিধান দেয়নি। কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কিংবা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বিধান হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম মানব জাতির সম্মুখে একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থা (Ideal Judicial System) উপস্থাপন করেছে। বর্তমান দুনিয়ার দেশে দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মত ইসলামী চার-ব্যবস্থা স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর কোনো মানব রচিত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এর ভিত্তি হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের[৩] হাদীস। ইসলামী বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে এ রচনায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করার পাশাপাশি এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার সাথে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সর্বশেষে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার মূল্যায়নের মাধ্যমে এ রচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা

১. আলকুরআনুল কারীমে বিচারের ধারণাঃ

বিচারের প্রতিশব্দ হিসেবে কুরআন মজিদে 'আ'দল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আ'দল শব্দের অর্থ হচ্ছে সমাজে যার যা প্রাপ্য, তাকে তা প্রদান করা। মহগ্রন্থ আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী বিচার-ফয়সালার কর্তৃত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের,"তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ফয়সালাকারী।"[৪] অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ "কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[৫]

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানব সমাজের দৈনন্দিন ব্যাপারাদিতে ফয়সালা দেয়ার কাজ নিজে এসে সরাসরি করেন না। তা করার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর মাধ্যেমে বিধান দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত স্বব্যাখ্যাতঃ

> "আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমানকারী ও তার সংরক্ষক। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমর নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"[৬]

বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী তা করতে হবে অন্যদিকে তেমনই ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করতে হবে। আল্লাহর বাণী ঃ "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে বিচার করবে।"[৭] কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[৮]

এমনকি অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের (Non-believer) ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের বাণীঃ "তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাদের বিচার-নিস্পত্তি করিও অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করিও; তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-নিস্পত্তি কর তবে ন্যায়বিচার করো; আল্লাহ ন্যায়পরায়নদেরকে ভালবাসেন।"[৯]

ন্যায়নিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল-কুরআন সকলকে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ ন্যায়বিচারে দৃঢ় থাকতে উদাত্ত আহ্বান জানায়, যদিও তা পিতা-মাতা বা নিকটজনের বিরুদ্ধে যায়। বলা হয়েছেঃ

> "হে মুমিনগণ! তোমারা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহর স্বাক্ষীস্বরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কটিয়ে যাও তবে জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"১০

কুরআন মাজীদ একটি শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করে সেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগ গড়ে তোলার তাকীদ দিয়েছে। "নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট প্রমানসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে ও তাঁর প্রচন্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য যথাবিধ কল্যাণ। এটি এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন, কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[১১]

উপর্যুক্ত আয়াতে প্রথমে আল কিতাব,তরপরে আল মীযান (ন্যায়বিচার) এবং শেষে আল হাদীদ (লৌহ) এর উল্লেখ রয়েছে। এ তিনটির পারস্পরিক সম্পর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। আল কিতাব (কুরআন) দ্বারা মতাদর্শ ও তত্ত্বগত শক্তি বোঝায়, আল-মীযান বা ন্যায় বিচার কর্মগত শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে, আর আল হাদীদ (লৌহ) যা বাঞ্চনীয় নয়, সে কাজ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করে।

মোটকথা আল্লাহর রাসূল সা. কে প্রেরণ, কিতাব ও মীযান নাযিল করা এবং লৌহ ধাতু ও লৌহশক্তি (রাষ্ট্র) সৃষ্টির মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে ইনসাফ ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠা, তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ গড়ে তোলা একান্তই জরুরি। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিচারের ধারণা কেবল আদালতের চৌহদ্দিতেই সীমিত নয়। বরং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত । আল কুরআন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়,এমনকি কাথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও । বলা হয়েছেঃ "যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে স্বজনদের সম্পর্কে হলেও।"[১২]

এছাড়াও আল কুরআনের নানা স্থানে বিচার সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন হাকীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে বিচারের যে কুরআনী ধারণা পাওয়া যায় তার সার কথা হচ্ছেঃ

- বিচার ফয়সালার কর্তৃত্ব স্বয়ং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের,
- আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুসরণ করে বিচার নিষ্পত্তি করতে হবে,
- আত্মীয়-স্বজন-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার করতে হবে,
- ন্যায়বিচার কেবল আদালতের চৌহদ্দিতে নয় বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রসারিত,
- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা দ্বীনী দায়িত্ব এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গড়ে তোলা জরুরী।

২. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ

২.১ ইসলাম পূর্ব বিচার ব্যবস্থাঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আরবের সমাজ তখন বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে গোত্র-প্রধানগণ বিচারকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেও দুটি গোত্রের মধ্যে বিবাদ-বিসংবদেও সমাধান বা নিষ্পত্তি সহজ ছিলনা। গোষ্ঠীগত কলহ বিবাদ প্রায়ই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হত। এ ধরণের বিরোধ মীমাংসার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় বিচারালয় ছিল না। আইন বলতে আমরা আজ যা কিছু বুঝি, ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

২.২ মহানীর সা. আমলে বিচার ব্যবস্থাঃ

মদীনায় হিজরতের পর মহানবী সা. প্রথমেই মদীনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর নিকট উপস্থাপিত মুসলমানদের সমস্যার সমাধান বা ফয়সালা দিতেন। কিছুদিন পর তিনি ইহুদী, খৃষ্টান এবং পৌত্তলিকদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে পরিচিত এবং বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসাবে স্বীকৃত। উক্ত সনদের মাধ্যমে মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটে, মহানবী সা. মদীনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পদাধিকার বলে তাঁকে মদীনার সর্বোচ্চ বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। মদীনা সনদের শর্ত অনুসারে সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে মহানবী সা. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার মীমাংসা করবেন মর্মে স্থির করা হয়। এভাবে নবী করিম সা. পরিপূর্ণ শাসক (Ruler) এবং বিচারক (Judge) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একই সাথে ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি।[১৩] Saq Husaini বলেন,

> "The Prophet himself acted as the Chief Justice of State with his seat at al Madina. The Judge of provinces were either directly appointed by him, or the governors were directed to appoint persons named by him.[১৪]

মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রের দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় তিনি নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বিচারকার্য সংক্রান্ত কঠিন দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ ও শিক্ষাদান করে পাঠাতেন। হযরত আলী (রাঃ)-কে ইয়ামেনের বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রাসূল সা. বলেছিলেন; "বিবাদমান দুই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বসবে তখন এক পক্ষের বক্তব্য শুনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তুমি কখনোই বিচারকার্য সম্পাদন করবে না-রায় দেবে না।"[১৫]

রাসূল সা. মামলা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর ওপর অর্পন করেছেন। অর্থাৎ যিনি মামলা দায়ের করবেন তাকেই সাক্ষ্য দ্বারা মামলার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে । কিন্তু কিভাবে সাক্ষ্য দিতে হবে? এ প্রসঙ্গে রাসূলের একটি হাদীসের উল্লেখই যথেষ্ট। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল করীম সা. বলেছেন "তুমি যদি ঘটনাটি সূর্যকে দেখার মত স্পষ্ট করে দেখে থাক তবেই সাক্ষ্য দেবে।"[১৬] একজন সাক্ষীর গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী কি কি তা রাসূলে আকরাম সা. নির্ধারণ করেছেন এবং অপরাধ নিরূপন ও শাস্তিপ্রদানের নীতিসমূহ স্থির

করেছেন। মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে দখল (Possession) কে মালিকানার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেত।

২.৩ হযরত আবু বকরের (রাঃ) সময়ে ঃ

রাসূলুল্লাহর সা. ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর আদালতে কোন মোকদ্দমা পেশ হলে তিনি সর্বপ্রথম কুরআনের বিধান মোতাবেক তার মীমাংসা করার চেষ্টা করতেন। কুরআনে কোনো সংশ্লিষ্ট হুকুম না পেলে তিনি সুন্নাতে রাসূল সা. এর নজীর অনুসন্ধান করতেন। সেখানেও কোন সমাধান না পেলে তিনি মুসলমানদের মতামত সংগ্রহ করতেন। তিনি কিয়াসের মাধ্যমে যে ফয়সালা দিয়েছেন তার নজীর হিসেবে দাদার মিরাস সম্পর্কিত মাসআলা[১৭] বিখ্যাত এতে তাঁর ইজতিহাদী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কেউ দাদা ও ভাই-বোন রেখে মারা যায় এবং তার পিতা ও সন্তনাদি না থাকে তাহলে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ কে? দাদা অথবা ভাই-বোন? এ প্রশ্নে হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ চৌদ্দ জন বিশিষ্ট সাহাবী দাদাকে পিতার স্থলে সম্পত্তির ওয়ারিশ মনে করেন এবং ভাই-বোনকে ওয়ারিশ গণ্য করেন না। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী (রাঃ) এই অভিমতের বিপক্ষে ভাই-বোনকে প্রকৃত ওয়ারিশ বিবেচনা করেন। কুরআন শরীফে বর্ণিত, 'কালালা' শব্দের ব্যাখ্যায় এ মতভেদ সৃষ্টি হয়। হযরত আবুবকরসহ একদল সাহাবীর মতে কালালা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার পিতা কিংবা সন্তান কেউই জীবিত নেই। আর হযরত ওমর (রাঃ) সহ অনেকের মতে সেই ব্যক্তিই কালালা যার কোন পুত্র নেই।[১৮] আল্লাহ তা'আলা, "হে রাসূল! লোকেরা! তোমার কাছে কালালা (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান) ব্যক্তির ব্যাপারে ফতেয়া জিজ্ঞেস করছে, বলে দাও,আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন ঃ যদি কোন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে,তাহলে সে (ঐ বোন) পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধাংশ পাবে। আর যদি বোন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে।"[১৯]

এ সময়ে হযরত উমর (রাঃ) প্রধান বিচারপতি এবং হরযত জায়েদ বিন সাবিত (রাঃ) ছিলেন দফতর সম্পাদক। প্রথম খলিফার শাসনামলে মানুষ এতটাই সন্তুষ্ট ছিল যে 'সিরাত আস-সিদ্দিক' গ্রন্থের লেখক জানান যে, বিচারক উমরের (রাঃ) দায়িত্ব পালনের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে আদালতে একটি মামলাও দায়ের হয়নি।[২০] ইজমা এবং ইজতিহাদের প্রবর্তনের মাধ্যমে এ শাসনামল বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

২.৪.হযরত ওমরের সময়েঃ

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) (৬৩৪-৬৪৪) বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বিচার বিভাগ (Judiciary) -কে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। পূর্বে প্রাদেশিক গভর্ণর (ওয়ালী) বিচার বিভাগের কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যেক প্রদেশে প্রধান কাজী (কাযী-উল-কুযাত) এবং প্রত্যেক জেলায় একজন কাযী নিযুক্ত করেন। উৎকোচ গ্রহণের পথ বন্ধ করার জন্য কাযীদের উপযুক্ত বেতন নির্ধারণ করা হয়। সমাধানযোগ্য সমস্যাবলীর জন্য ফতোয়া বিভাগ কায়েম করা হয়। হযরত আলী (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, হযরত উবাই কা'ব (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) এই বিভাগের সদস্য ছিলেন। অবশ্য দ্বিতীয় খলীফার আমলে ফৌজদারী অপরাধের জন্য পৃথক কোনো আদালত (criminal court) ছিল না। একই বিচারক দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার বিচার করতেন। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) 'আহদাস' বা পুশিল বিভাগ গঠন করেন। হযরত ওমর (রাঃ) ই সর্বপ্রথম কারাগার ও দেশান্তরে শাস্তি প্রবর্তন করেন। SAQ Husain এর মতে,

> "For the first time 'Umar established prisons. In Makkah he purchased the house of Safwan bin Umayyah and converted it into a prison. Such prisons were established in important provincial centres. 'Umar was also responsible for introducing exile as a punishment."[২১]

আবু সাহজান সাকাফীকে পর পর মদ পান করার অপরাধে একটি দ্বীপে দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হয়।[২২] হযরত ওমর (রাঃ) কুফার শাসনকর্তা আবু মুসা আল আশারীর নিকট যে ঐতিহাসিক ফরমান প্রেরণ করেন সেটিতে বিচারকের অবশ্য পালনীয় মৌলিক নীতিসমূহ বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। ফরমানটির আক্ষরিক অনুবাদ এ রকম:

> "আল্লাহর প্রসংশা কীর্তিত হোক। এখন ন্যায়বিচার একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তোমার উপস্থিতিতে তোমার এজলাসে এবং তোমার রায়ে সকল মানুষকে সমান ব্যবহার দেখাবে, যাতে দুর্বল ন্যায় বিচারে আস্থা না হারায় এবং সবল অনুগ্রহের আশা না রাখে। প্রমাণের ভার বাদীর উপর এবং অস্বীকৃতি যেন শপথ নিয়ে করা হয়। আপোষ করা যেতে পারে কিন্তু তার জন্য ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায় করা চলবে না। পুনর্বিবেচনায় তোমর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে কোনো বাধা যেন না জন্মে। (যদি পূর্বসিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়)। কোনও প্রশ্নে সংশয় দেখা দিল এবং আলকোরআন কিংবা মহানবীর সা. সুন্নায় তার বিষয়ে কিছু না পাওয়া গেলে প্রশ্নটি পুনরায় চিন্তা করো । নজীরসমূহও অনুরূপ পূর্ব মামালগুলিও বিবেচনা করবে এবং তারপর উপমা-নির্ভর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। যে সাক্ষী উপস্থিত করতে চায়, তাকে শর্তাধীন হতে হবে। যদি সে দাবী প্রমাণ করে তবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর, অন্যথায় তার মামলা খারিজ হবে। সব মুসলিমই বিশ্বসযেগ্য। কিন্তু তারা নয় যারা বেত্রদন্ড লাভ করেছে, কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, কিংবা যাদের ওয়ারিশ সম্বন্ধে সংশয়াকুল।"[২৩]

২.৫ হযরত উসমান (রাঃ) এর সময়ে ঃ

বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) (৬৪৪-৬৫৬) বস্তত তার পূর্ববর্তী খলীফাদেরই অসনুরণ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) নিজের অনেক ইজতিহাদের মাধ্যেমে অনেক কঠিন বিষয় সহজ করে দেন। যেমন দীয়াতের ক্ষেত্রে উট দেয়ার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) উটের পরিবর্তে তার মূল্য দান করাও বৈধ বলে গণ্য করেন।"[২৪]

২.৬ হযরত আলীর (রাঃ) সময়ে ঃ

আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীনের সর্বশেষ খলীফা হযরত হযরত আলী (রাঃ) (৬৫৬-৬৬০) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মিসরের গভর্ণর হিসেবে মালিক ইবনে হারিক আশতারের নিয়োগপত্রের সঙ্গে ৬৫৮ খ্রি. হযরত আলী (রাঃ) প্রয়োজনীয় উপদেশ সংবলিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে তিনি বিচার বিভাগ সম্পের্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

> "কাযীদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে কায়ীউল কুযাত মনোনীত করবে। তিনি এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি পারিবারিক চিন্তা ভাবনা দ্বারা পীড়িত নন, যাঁকে ভয় দেখানো যায় না, যিনি কারো ধমকের ভয়ে ভীত নন, যিনি বারবার ভুল করেন না কিংবা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেননা, যিনি একবার সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তা থেকে সরে যান না, যিনি আত্মকেন্দ্রিক নন, যিনি সকল ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ না জেনে ফয়সালা প্রদান করেননা, যিনি প্রতিটি সন্দেহমূলক বিষয়কে সতর্কতার সংগে মেপে দেখেন এবং সমস্ত কথাকে গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে তবেই ফয়সালা দেন, যিনি উকিল কিংবা আইনজীবীর পেশকৃত সাক্ষ্যপ্রমানের উপর জিদ করেননা, যিনি স্বীয় ফয়সালা ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নিরপেক্ষ থাকেন, যাঁকে খোশামদ পথভ্রষ্ট করতে পারেন না এবং যিনি স্বীয় মর্যাদার কারণে গর্বিত নন। এমন লোক পাওয়া কিন্তু সহজ নয়। একবার এ পদের জন্য উপযুক্ত পাওয়া গেলে তাকে নিযুক্তি দানের পর এমন একটা যুক্তিসংগত সম্মানী প্রদান করবে, যাদ্বারা তিনি আরাম-আয়েশের সংগে তাঁর মর্যাদা মাফিক জীবন ধারণ করতে পারেন এবং লোভ লালাসার উর্ধ্বে থাকতে পারেন। তুমি তোমার দরবারে তাঁকে এমন উচ্চাসন প্রদান করবে, যা পাবার কথা কেউ ভাবতেও পারেনা"[২৫]

ফিক্‌হ ও ইজতিহাদে হযরত আলী (রাঃ) পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। কুরআন মজীদ ইজতিহাদ ও মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্র তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, উত্তরাধিকার আইনে 'আউল' বা বৃদ্ধি এর প্রবর্তকও হযরত আলী।"[২৬] অপরাধ ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও হযরত আলী (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ নজীর স্থাপন করেছেন। মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রে দোররার সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, হযরত আলী (রাঃ) এজন্য ৬০ দোররা নির্ধারণ করেন।[২৭] অপরাধী সব্যস্ত করার জন্য নিছক অপরাধের ঘটনা যথেষ্ট নয়, মূল অপরাধ কার্যে লিপ্ত হওয়া জরুরী। একবার এক ব্যক্তি গৃহে সিঁদ কাটল; কিন্তু কোনো কিছু চুরি করার আগে সে ধরা পড়ল। হযরত আলী (রাঃ) এর সামনে তাকে পেশ করা

হলে তিনি তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দিলেন না। এক ইয়াহুদী ব্যক্তি খলীফা হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ম চুরি করেছিল। খলীফাতুল মুসলেমীন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় বিচারপতি শোরাইহের আদালতে মুকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। তিনি (খলীফা) নিজের পুত্র হযরত হাসান এবং ক্রীতদাস কুনবারকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেন। কিন্তু কাজী শুধু এই জন্যই মামলা খারিজ করে দিলেন যে, ইসলামী বিচার নীতি অনুসারে খলীফাতুল মুসলেমীন নিরপেক্ষ সাক্ষী পেশ করতে পারেননি । এ অবস্থা দেখে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে, "যে ধর্মে এমন সুবিচারের ব্যবস্থা রয়েছে, তা অবশ্যই সত্য ধর্ম"।[২৮] স্বয়ং খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের আদালতে হাযির হয়ে মামালা দায়ের এবং কাযীর নির্ভীক চিত্তে খলীফার মামলা খারিজ করার মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের প্রাধ্যন্যের যে নজীর স্থাপিত হল তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে মহান আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসূল স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে যে বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সেটাই খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিকশিত হয় এবং পরবর্তী ইমামগণের গবেষণার ফলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে মুসলিম দেশসমুহে ইসলামী ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে[২৯] প্রতিষ্ঠিত না থাকা সত্ত্বেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্যের জন্য এর অনেক নিয়ম নীতি এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

৩. ইসলামী আইনের উৎস (Sources of Islamic Law)

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের স্বীকৃত উৎস ৪টি (চারটি)[৩০]। যথা, আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। নিচে এ উৎসগুলি সম্পর্ক আলোচনা করা হলো ঃ

৩.১. আল-কোরআন ঃ

ইসলামী আইনের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উৎস 'আল-কোরআন'। আল কোরআন-এর শাব্দিক হচ্ছে 'যা পড়া হয়েছে' বা 'য আবৃত্তি করা হয়েছে'। এটা হচ্ছে উম্মী বা নিরক্ষর নবীর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহর বাণী যা হুবহু মানুষের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা. আল্লাহর কাছ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়ে প্রথমে মক্কায় ইসলাম প্রচার এবয় পরবর্তীতে একটি ইললামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। মক্কা ও মদীনায় মহানবী (সা) এর তেইশ বৎসরব্যাপী কর্ম ও সংগ্রামমুখর জীবনের বিভিন্ন সময় ও ঘটনার প্রয়োজনে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। আল কুরআন ইসলামী আইনের প্রাথমিক উৎস হলেও আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এতে নেই। বিস্তারিত এবং সম্পূরক প্রশ্নাবলী, স্থান-কাল,অবস্থান এবং সামাজিক অবস্থার প্রয়োজনে ব্যক্তির সুবিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কতিপয় করণীয় বিষয় যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবস, ফৌজদারী দন্ডবিধি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদিতে মানুষের করণীয় সর্ম্পকে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয় । অপরদিকে এর নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কিত বিধিমালা যেমন, মদ্যপান, সুদ,জুয়াখেলা, খুন, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ও প্রতারণা এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপসনা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই পরিবর্তনীয় নয়। সংক্ষেপে আল কুরআনের চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল ঃ

প্রথমত, আল কুরআন এক সাথে নয়, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়াত আকারে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের তাকিদে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.এর উপর নাযিল হয়েছে। এই আয়াতসমুহ মুসলিম উম্মাহর পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত। দ্বিতীয়ত, আল-কুরআন কতিপয় সাধারণ নীতিমালা ও বৃহত্তর দিক নির্দেশনা মাত্র। এতে কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। তৃতীয়ত, আল-কুরআনের আইনগত আয়াতসমূহের পরিধি সীমিত এবং সংখ্যাও কম (৬,৬৬৬ খানা আয়াতের মধ্যে মাত্র ২০০ খানা শরীয়া সম্পর্কিত)। চতুর্থত, আল-কুরআন প্রধানতঃ বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সম্পর্কিত একখানা গ্রন্থ।

৩.২ আস-সুন্নাহ ঃ

সুন্নাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ, হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রদর্শিত পথ। সুন্নাহ ইসলামী আইনের অন্যতম মুখ্য উৎস যা কুরআনের সহায়ক। উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কুরআনে বারবার মুমিনদেরকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের

তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসবরে বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধিতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। রাসূল সা. এর সুন্নাতে কোন ওয়াক্তে কত রাকাত সালাত কোন নিয়মে আদায় করতে হবে, ওযুর নিয়ম-কানুন কি এবং যাকাত কাকে দিতে হবে ও এর পরিমান কত ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এভাবে সুন্নাহ কুরআনে বর্ণিত ইসলামী আইন ও নীতিমালাকে প্রশস্ত করে এবং এর সাথে নতুন আইন ও রাসূল সা. এর বিবেচনায় নতুন অনুমোদন প্রদান করে। রাসুল আকরাম সা. এর বাণী, নির্দেশনা, আচরণ,বিষয়ের ব্যাখ্যা, অনুমোদন ও উদাহরণ (কোরআন ব্যতীত) প্রভৃতি সুন্নাহর অন্তর্ভূক্ত। সংক্ষেপে সুন্নাহ হচ্ছে সেই জ্ঞানভান্ডার, যা বিচারক হিসাবে রাসুল সা. এর সিদ্ধান্ত সমূহকে ধারণ করে। ব্যক্তিগত আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি, অভ্যাস,বক্তৃতা, তার জীবদ্দশায় অনুমোদিত আরবের সাধারণ প্রচলিত প্রথা এবং অনুসারীদের প্রতি উপদেশ সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে হাদীসের সংকলন। এটা এমন এক সমৃদ্ধ ও বহুমাত্রিক জ্ঞানভান্ডার যা আজও বিশ্বব্যাপী,দেড়শ কোটি মুসলিমের জীবনকে প্রভাবিত করে।

সুন্নাহকে কুরআনের পর পরই ইসলামের পবিত্র দলিল হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সকল মুসলামন বিশেষত ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে জীবনের আদর্শও লক্ষ্যে পৌছতে রাসূলের সা. সুন্নাহ-কে গ্রহণ ও অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ "হে মুমিনগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমারা আনুগত্য কর আল্লাহর,আনুগত্য কর রাসূলের"[৩১]। "কেহ রাসূলের সা. আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল"[৩২]। "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর"[৩৩]। অনুরূপভাবে রাসূল সা. এরবিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণের আহ্বান ঃ "হে মানব জাতি! আমি তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি দৃঢ়ভাবে তা ধারণ কর তবে কখনোই পথ ভ্রষ্ট হবে না । তা হলো ঃ আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ"। [৩৪]

৩.৩ আল ইজমা ঃ

শাব্দিক অর্থে ইজমা হচ্ছেঐকমত্য। একটি বিশেষ সময় কোনো বিশেষ প্রশ্নে মুসলিম আইনজ্ঞদের ঐকমত্যকে আইনের পরিভাষায় ইজমা বলে। কুরআন ও হাদীসে পর এটাই হচ্ছে ইসলামী আইনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইজমার সমর্থনে কুরআন ও হাদীসে বেশ কিছু উক্তি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ঃ "তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী আনুগত্য।"[৩৫]

আইনগত কোন অধিকার এবং কোন দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে রাসূল সা. তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণ অথবা কোনো বিশেষ সময়ের আইনবেত্তাগন (Muslim Jurists) সর্বসম্মতভাবে কোনো ঐকমত্যে পৌছে উপস্থিত সমস্যা সমাধানে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাই ইসলামী আইনে ইজমা নামে পরিচিত। কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনো সমস্যার সরাসরি কোনো সমাধান পাওয়া না গেলেই ইজমার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা কোনো ক্রমেই কুরআন ও হাদীসের সাথে সংঘাতমূলক হবে না। যেমন মদ্যপানের জন্য ৮০ টি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করা"[৩৬]। এবং রাসূলের সা.ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) কে খলীফা মনোনীত করা। রাসূল সা.এর জীবদ্দশায় একবার তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নামাযে ইমামতি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩৭] উক্ত ঘটনা থেকে সাহাবীগণ কিয়াসের মাধ্যমের উক্ত ইজমায় পৌছেন।

৩.৪ আল কিয়াস ঃ

কিয়াস মানে তুলনামূলক অনুমান। কোরআন, হাদীস ও ইজমার আলোকে বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি, ইংরেজিতে যাক 'Analogical deduction or reasoning' বলা হয়। যে প্রশ্নে আল কুরআন নীরব। আল হাদিস নিশ্চুপ, সে প্রশ্ন যে, যখন সমাধান চায় তখন তা কোথায় পাওয়া যাবে? তখনই কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সহজ কথায়, মূল আইন যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে যুক্তির আলোকে নতুন প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে কিয়াস বলে। কিয়াসের সমর্থনে যে হাদীসটি উল্লেখযোগ্য তা নিম্নরূপঃ

"রাসূলুল্লাহ সা. মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে?, উত্তরে মু'আয (রাঃ) বলেছিলেন, 'আল্লাহর কিতাবের

ভিত্তিতে, । অতঃপর রাসূলাল্লাহ সা. জিজ্ঞস করলেন' 'যদি তাতে কোন বিষয়ে সমাধান না পাও? তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসূলের সা. সুন্নাহ অনুযায়ী, । পুনরায় রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'যদি তাতেও সমাধান না পাও?' 'সে অবস্থায় আমি ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করব।' মু'আযের জবাব। সা. তার এই উভয় কথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন রাসুলুল্লাহ। এ হাদীসের মাধ্যমে কিয়াসের সুস্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।

৪. অপরাধ এবং শাস্তি ঃ

ইসলামে পাপাচার ও জুলুম সমার্থক শব্দ। কোন বস্তু বা বিষয়ের অধিক যথাযথ ভাবে না দেয়া কিংবা যে বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সেমতে ব্যবহার না করাই হচ্ছে পাপ বা অপরাধ। ইসলাম সামাজিক অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে ভাগে করেছে। যথা-হুদুদ,কিসাস এবং তাজিরাত। নীচে এদের বর্ণনা দেয়া হল।

৪.১ আল হুদুদ ঃ

হুদুদ হচ্ছে সেই অপরাধ যার শাস্তি নির্ধারিত এবং যা কম বেশী করা যাবে না। সাধারণত ছয়টি অপরাধ মদ্যপান, চুরি, সশস্ত্র ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ এবং ইসলাম পরিত্যাগ (apostasy) প্রভৃতি অপরাধকে হুদুদ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু আল-কুরআনে মদ্যপান এবং ধর্মত্যাগ এর শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। সুন্নাহ তথা রাসুলুল্লাহ সা. এর বাস্তাব কর্মের মাধ্যমে এসবের শাস্তিও নমুনা পাওয়া যায়।[৩৯] যে চারটি অপরাধের শাস্তি কুরআন এবং সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে তা নিচে আলোচিত হলঃ

ক. চুরী ঃ

চুরির শরীয়তগত সংজ্ঞা হচ্ছে অন্যের মাল বিনা অনুমতিতে মালিকের হেফাজতের স্থানে নিয়ে যাওয়া। অভাবের তাড়না ব্যতিত অভ্যাসগত বা পেশাগত চৌর্যবৃত্তির শাস্তি হচ্ছে হাত কেটে দেয়া। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দন্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৪০] মহানবী সা. চুরিকে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। মদীনার ধনী ও অভিজাত বংশের এক মহিলা চুরি করে ধরা পড়েছিল। হযরত সা. দরবারে এই মামলা দায়ের করা হলো। উসমা ইবনে জায়েদ (রাঃ) আসামীর পক্ষে সুপারিশ করতে শুরু করায় নবী মোস্তফা সা. গম্ভীর স্বরে বললেনঃ

> "পূর্ববতী মানুষ ঠিক তখনই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যখন তাদের অভিজাত বংশের কোনো লোক চুরি (কিংবা অনুরুপ কোনো অপরাধ) করলে, তাকে ছেড়ে দিত, কিন্তু দুর্বল বা নীচু বংশের কোনো লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর শপথ চুরির অপরাধে ধৃত এই ফাতিমা যদি আমি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও হত, তবে আমি তার হাতও না কেটে ছাড়তামনা।

খ. ডাকাতি ঃ

আল কুরআনে ডাকাতির শাস্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছেঃ "যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে দুনিয়ায় এটা তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[৪১] উক্ত আয়াতের অর্থ মোতাবেক শুধু ডাকাতির শাস্তি হচ্ছে এক পাশের হাত আর অন্য পাশের পা ফেলা দেয়া। অর্থাৎ ডান হাত কাটলে বাম পা কেটে দিতে হবে আর ডাকাতি করতে গিয়ে লোক হত্যা করলে সেক্ষেত্রে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড।

গ. ব্যাভিচার ঃ

ব্যাভিচারের জন্য বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা । এই শাস্তি রাসূলের (সাঃ) দ্বারা নির্ধারিত। সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত এটিই একমাত্র হদ।[৪৩] আর অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে ব্যাভিচারের শাস্তি একশত কশাঘাত। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"ব্যাভিচারিনী ও ব্যাভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে; আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবম্বিত না করে, যদি তোমারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মুমিনদিগের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।"[৪৪]

ঘ. ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগঃ

ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি আশিটি কশাঘাত। কুরআনের আয়াতে এই শাস্তিটি নির্ধারিত হয়েছেঃ "যারা স্বামী রমনীর অপবাদ আরোপ করে এবং চারি জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।"৪৫

৪.২ কিসাস ঃ

ইসলামী আইনে নরহত্যা, শারীরিক আঘাত প্রভৃতির শাস্তি হল হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং আঘাতের পরির্বতে সমপরিমান আঘাত। ইসলামী আইনে একে কিসাস বলে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ "হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বীধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুরূপ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয় । এটি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিহতের ওয়ালী অর্থাৎ নিকট-আত্মীয়, আঘাতপ্রাপ্ত বা নিহত ব্যক্তি দাস হলে তার মুনিব কিসাস দারী করতে পারে, হত্যা বা শারীরিক আঘাতে অভিযোগে কউকে অভিযুক্ত করা হলে সে যদি অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে মীমাংসা করে তখন বিচারক অভিযুক্ত এক খালাস দেন। নচেৎ আসামী দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। হত্যা ও শারীরিক আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরনকে 'দিয়াত' বলে । নিহত ব্যক্তির একাধিক ওয়ারিশের মধ্যে একজন হত্যাকারীকে মাফ করে দিলে অপর ওয়ারিশ/ওয়ারিশগণ কিসাস দাবী করতে পারে না। তবে তারা 'দিয়াত' ক্ষতিপূরণের অংশ দাবী করতে পারবে।

৪.৩ তাজির (Tazir)ঃ

উপরিবর্ণিত হুদুদ এবং কিসাস শ্রেণীর অপরাধ ব্যতীত অপর সকল অপরাধের জন্য বিচারক নিজস্ব বিচার বুদ্ধি মতে অপরাধীকে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী জরিমানা, বেত্রাঘাত থেকে কারাদন্ড পর্যন্ত যে কোনো প্রকার শাস্তি বা উভয় প্রকার দিতে পারেন। ইসলামী আইনে এ শ্রেণীর শাস্তি দানকে তাজির বলা হয়েছে।

৫. দেওয়ানী প্রতিকর ঃ

ইসলামী আইনে কারও কৃতকর্মের জন্য অপরের কোনও সম্পত্তি খোয়া গেলে বা নষ্ট হলে বা সম্পত্তি হতে অন্যায় ভাবে দখলচ্যুত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে সে সম্পত্তি বা অনুরূপ সম্পত্তি বাদীকে ফেরৎ দিতে বিবাদী বাধ্য। তাছাড়া ঐ সম্পত্তি থেকে বিবাদী উপসত্ব লাভ বা ভোগ করে থাকলে তাও বাদকি ফেরৎ দিতে হবে।[৪৭]

৬. সাক্ষ্যদান ঃ

সাক্ষী হলো বাদীর প্রমাণ এবং বিবাদীর পক্ষে বাদীর দাবী অস্বীকারের উপায়, ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আলালাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন: "সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।"[৪৮] অর্থাৎ সাক্ষীকে তলব করা হলে তাকে অবশ্যই আদালতে উপস্থিত হতে হবে। কেবল আদালতে উপস্থিত হলেই চলবে না একজন সাক্ষীকে অবশ্যই সে যা জানে তা অবিকল প্রকাশ করতে হবে। সাক্ষ্য গোপনকারীর অন্তর অপরাধী। ইরশাদ হয়েছে। " তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেহ তা গোপন করে তার অন্তর অপরাধী।"[৪৯] উক্ত আয়াতের মমার্থ হল সাক্ষ্য

গোপন করা যাবে না। সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে তা যদি আপন-জনের বিপক্ষেও যায়। কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় মুমিনদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর স্বাক্ষী-স্বরূপ। যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিত-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা বিত্তহীন আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।"[৫০] এই আয়াতের মর্ম বাণী হচ্ছে সাক্ষীরা মূলত আল্লাহর সাক্ষী কোনও বিশেষ পক্ষের নয়। কোনও বিশেষ পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেন কেউ সাক্ষ্য না দেয়া তা নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষীর ব্যাপারে ইসলাম কিছু জরুরী শর্ত আরোপ করেছে, শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

- সাক্ষীকে পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে; অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোনও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
- পূর্ণ ও সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে,পাগল বা মস্তিক বিকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
- স্বাক্ষীকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে।
- দুস্কৃতির অভিযোগে পূর্বে অভিযুক্ত হয়েছে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
- স্বাক্ষীকে ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হতে হবে। চরিত্রহীন বা শরীয়াত লংঘনকারী ব্যক্তির সাক্ষী অগ্রহনযোগ্য।[৫১]

সাক্ষ্যদানকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'শাহাদাত'। এর শাব্দিক অর্থ হলো উপস্থিতি। অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় যে লোক উপস্থিত ছিল, যে লোক নিজ চক্ষে ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে, সেই পরে সাক্ষ্যদান করছে। সেই পরে সাক্ষ্যদান করছে। অকাট্য সুদৃঢ় বর্ণনা, যা আইনের বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে এমন ব্যাপারে দেয়া, যা বর্ণনাকারী স্পষ্টভাবে দেখেছে।"[৫২] এটাই সাক্ষ্যের সংজ্ঞা। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দু'জন বিশ্বসযোগ্য পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য বা আসামীর চারবার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই নরহত্যার মামলায়, চারজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বা আসামীর চারবার আসামীর চারবার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জিনা বা ব্যাভিচার এবং ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া যায়। দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা আসামীর দুবার স্বীকারাক্তির মাধ্যেমে মদ্যপানের ও চুরির অপরাধে শাস্তি দেয়া যায়। তাজির শ্রেণীর অপরাধে আসামীর স্বীকারোক্তি বা দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য বা অনুমানের ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যায়। দেওয়ানী মামলায় বাদীকে তার বাদী প্রমান করার জন্য অন্ততপক্ষে দুজন বিশ্বসযোগ্য সাক্ষী হাজির করতে হয়। মামলা প্রমানের বিশেষ বিধান না থাকলে যদি বাদী বা ফরিয়াদী কোনো সাক্ষী হাজির করতে না পারে বিবাদীকে বাদীর দাবী কাজীর নিকট হলফ শিয় অস্বীকার করতে হয়। অন্যথায় বিচারক বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে বাধ্য।

৭. বিচারক হিসেবে কাজী ঃ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকার্য করতে খলীফা অথবা তার পক্ষে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কাজির পদে অর্থাৎ বিচারকের পদে লোক নিযুক্ত করতেন। মহানবী সা. স্বয়ং মুয়াজ বিন যাবাল, আবু মুসা আল-আশ্'আরী এবং আলী বিন আবু তালেবকে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ইসলাম বিচারকের কতিপয় গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে যা বিচাররেক মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক। গুণগুলো হচ্ছে ঃ[৫৩]

- পূর্ণ বয়স্কতা, বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা,ঈমানদার হওয়া, চরিত্রবান ও ইজতিহাদের যোগ্যতা[৫৪], জন্মের পবিত্রতা, আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান ও বিচক্ষণতা, বিচারকের স্বরণশক্তির তীক্ষ্মতা মেধা ও প্রতিভা।[৫৫]

কাজীকে প্রকাশ্য স্থনে বিচার করতে হবে। কাজীর পক্ষে যত্রতত্র গমন নিষিদ্ধ ছিল। নিকট আত্মীয় বা অল্পবয়স্ক বন্ধু ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে উপটোকন নেয়া যাবে না। রাগান্বিত অবস্থায়বিচার কার্য থেকে বিরত থাকা।[৫৬] প্রশাসকও বিচারের ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারতেন। সকল ফৌজদারী আদালত কাজীর রায় ও ডিক্রি কার্যকর করে কাজিকে তার কাজে সাহায্য করতেন। খলীফাদের আমলে যে বিচার ব্যবস্থা ছিল তাহা

ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট ও বাদশাগণ অক্ষুন্ন রাখেননি। তারা বিচার ব্যবস্থার প্রধান পদে কাজি-উল-কুজ্জাত নিযুক্ত করে তার উপর অন্য কাজিদের কাজের তদারক ও তাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং কাজি-উল-কুজ্জাতের বিচারের দ্বারা কেউ ক্ষুব্ধ হলে বাদশা স্বয়ং তার রায়ের বিরুদ্ধে আনীত আপীলের বিচার করতেন।

৮. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে রয়েছে মহান রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। কারণ আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৫৭] মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নির্দেশ দানের ও আইন রচনার অধিকার নেই।[৫৮] আল্লাহর তরফ হতে নবী (সা ঃ) যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন। তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। আল্লাহর আইন তার বান্দাহদের উপর জারি করাই হচ্ছে বিচারকের কাজ। এ কাজ একটি দ্বীন দায়িত্বও বটে। বিচারক আদালতের আসনে আমীর বা খলীফার প্রতিনিধি হয়ে বসবেন না। বস্তুত তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসবেই তথায় আসীন হবেন। ইসলামী ব্যবস্থার অনুপম বৈশিষ্ট্যসমূহ নীচে আলোচিত হল ঃ

৮.১ বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা (Freedom of judiciary) ঃ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাব হতে মুক্ত। আদালতের সীমার মধ্যে স্বয়ং খলীফার (রাষ্ট্রপ্রধান) পদমর্যাদারও কোনও গুরুত্ব থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে কোন ব্যক্তি স্বীয় বংশগত, ব্যক্তিগত বা সরকারী পদমর্যাদার দরুন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। একজন সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রের যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদলতে মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। এমনকি স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধেও এই মোকদ্দমা পেশ হতে পারে এবং ফরিয়াদীর স্বত্ত্ব প্রমাণিত হলে আল্লাহর আইন খলীফার প্রতি ও প্রযোজ্য হবে।

৮.২ সুবিচারের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-নীতির পূর্ণ কার্যকারিতা ঃ

ইসলাম বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণ থাকার শর্ত আরোপ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং বিচার কাজ সম্পাদনের কতিপয় নিয়ম-নীতিও নির্দিষ্ট এবং কার্যকর করেছে। সহজ কথা বিচারের করণীয় এভং বর্জনীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে। যেমন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেউ সীমা লংঘনমূলক কাজ করলে তাকে নম্রতা সহকারে বুঝিয়ে দিতে হবে ও তাকে ক্ষান্ত হতে বাধ্য করতে হবে। ক্রুদ্ধ হয়ে রায় লেখা যাবে না। সালাম, সম্মান প্রদর্শন, আসন গ্রহণ, দৃষ্টিদান, কথাবার্তা বলা, লক্ষ্য আরোপ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে হবে।

৮.৩ গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান ঃ

ইসলাম সাক্ষ্যের উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছে যার নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষীর ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী হওয়া এতটাই জরুরী যতটা জরুরী স্বয়ং বিচারকের ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হওয়া। তাছাড়া বিচার্য বিষয়ে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা বা অধিকার কেবল তারই। নবী করমী সা. ইরশাদ করেছেন: "সাক্ষী যখন ঘটনাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পারে তখনই যেন সাক্ষ্য দেয়। নতুবা দুঃসাহস যেন সে না করে।"[৫৯] ইসলামী বিচারব্যবস্থায় চরিত্রহীন, দুস্কৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য সাক্ষ্য নয়। আল্লামা শিবলী নোমানী বলেন ``That every Muslum was Qualified to give evidence provided that he had not undergoneany punishment previouslu abd provided also that his false testimony had not been already proved."[৬০]

এমনকি পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রী,দাস - মনিব প্রভৃতি লোকদের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দান। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখি,চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ম হারিয়ে তিনি আদালতে আর্জি পেশ করেছিলেন। কাজি তাকে বিচারকের নিয়মানুসারে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। তখন তিনি নিজের পুত্র হযরত হাসান এবং ক্রীতদাস কুনবার কে আদালতে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছিলেন। কিন্তু কাজি শুধু এই জন্যই তার মুকদ্দমা খারিজ করে দিয়েছিলেন যে, ইসলামের বিচার নীতি অনুসারে তিনি (খলীফাতুল মুসলেমীন) নিরপেক্ষ সাক্ষী পেশ করতে পারেননি।

৮.৪, বিচারকের রায় কার্যকর করার নিশ্চয়তাঃ

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের রায়কে যথোচিতভাবে কার্যকর করার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে আদালত চূড়ান্তভাবে রায় প্রদান করলে তার কার্যকারিতা যাতে কেউ বানচাল করতে না পারে, সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) রয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধীর উপর তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। অপরাধী শক্তিমান হোক কি দুর্বল হোক। উচুঁ বংশজাত সম্ভ্রান্ত হোক কি নীচু বংশগত হোক। সে পুরুষ কি নারী হোক শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনও ব্যত্যয় ঘটতে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো কিংবা তা বিলম্বিতকরণ অথবা আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করা কোন রূপ দয়া-মমতা প্রদর্শনের অধিকার কারো নেই।

৮.৫ আইনের চোখে সকলেই সমানঃ

ইসলামী ফৌজদারী আইনের দৃষ্টিতে বড়-ছোট, গরীব-ধনী, শাসক-প্রজা, উচু-নীচ এবং আপন পরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেকে পর্যন্ত বিচার ও প্রতিশোধের জন্য পেশ করতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর পুত্র আবু শাহমাও এই আইনের বিচারে মদ্য পানের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে খলীফার নিজের নির্দেশক্রমে দন্ডিত হয়েছিল এবং তাতেই সে প্রাণ ত্যাগ করেছিল।[৬১] মিশরের গভর্ণর আমর ইবনে আসের ছেলে আবদুল্লাহ এক ব্যক্তিকে প্রহার করে সে ব্যক্তি খলিফার দরবারে নালিশ করে হযরত ওমর স্বয়ং সে ব্যক্তিকে দিয়ে আব্দুল্লাহকে চাবুক মারেন।[৬২]

৮.৬. ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তাঃ

যেখানে বাদী, বিবাদী উভয়ই মুসলমান। ইসলাম কেবল সেখানেই সুবিচার করতে পারে না। ইসলামী হুকমতের কাজিকে সর্বক্ষণ সুবিচারের মানদন্ড ধারণ করে থাকতে হবে। উভয় পক্ষ মুসলমান কিনা কিংবা এর অনুরূপ উভয় পক্ষ অমুসলিম কিনা সেদিকে বিচারকের কোনই নজর থাকবে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি তাঁর নিরপেক্ষ বিচার দন্ড সমানভাবে প্রযোজ্য। কোনও এক পক্ষ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব মুসলিম বিচারের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

৮.৭. বিচারের সহজ প্রক্রিয়াঃ

প্রচলিত ওকালতি ব্যবস্থায় উকীলরা সাধারণত মক্কেলকে মামলায় জেতানোর জন্য চেষ্টা করে থাকেন যদিও সে অপরাধী হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামে বিচার ব্যবস্থায় বর্তমান পদ্ধতির ওকালতি প্রথার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই সেখানে আইনবিদগণ মুকদ্দমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনা বিশ্লেষণের জন্য বিচারকের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করেন। এমনকি আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মত আইন মোতাবেক সময়ের মধ্যে আদালতে আবেদন করা না হলে বিচার ব্যবস্থা সহযোগিতা লাভের অধিকার তামাদি হয়ে যায় না।

৮.৮. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। ন্যায়পরায়তা ও সুবিচারহীন রাষ্ট্র 'ইসলামী রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হতে পারে না। সমসাময়িক বিচার ব্যবস্থার মত কোর্ট ফি প্রদানের বিধানও ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় নেই। কেননা এতে করে দরিদ্র ব্যক্তি ফি প্রদানের অক্ষম হয়ে ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। ইসলাম কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বাধা দূর করতে বদ্ধপরিকর।

৯. ইসলামী বিচার ব্যবস্থা বনাম সমসাময়িক বিচার ব্যবস্থাঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলার তরফ হতে মহানবী সা. যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন, তাই ইসলামী বিচার ব্যবস্থার চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। অপরদিকে বর্তমান দুনিয়ায় দেশে দেশে যে বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে মানব রচিত আইন। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক আল্লাহর প্রতিনিধি হিসিবে দায়িত্ব পালন করেন এবং এই দায়িত্ব পালনের পেছনে যে মনোভাব ক্রিয়াশীল তা হল মহান আল্লাহর নিকট তার কাজের চূড়ান্ত জবাবদিহীতা। কিন্তু সমসাময়িক অপর কোনো বিচার ব্যবস্থায় বিচারক আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন না।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে মানদন্ড আরোপ করা হয়েছে সমসাময়িক বিচার ব্যবস্থায় তা দেখা যায় না। ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় ঈমানদারিত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, পক্ষপাতহীন এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ বিচারক হতে পারবে না। অপরাপর বিচার ব্যবস্থায় বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুরূপ কঠোর মানদন্ড না থাকায় নৈতিক মূল্যবোধ শুন্য পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিও বিচারক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে সার্টিফিকেট জালিয়াতির[৬৩] অভিযোগের অভিযুক্ত ব্যক্তিত্ব হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। ফলে এ ধরনের বিচারকের দ্বারা পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সাক্ষী নির্বাচনের ব্যাপারেও ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছে তার ফলে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। কিন্তু যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। সেখানে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ওকালতীর মারপ্যাচের জোরে প্রকৃত অপরাধীকে বেকসুর খালাস প্রদানের ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বর্তমান পদ্ধতির ওকালতী প্রথার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সেখানে আইনবিদগণ মুকদ্দমার স্বরূপ নির্ধারণ এবং ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য বিচারকের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবেন।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার ইসলামী বিচার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক অন্যান্য বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচারের কথা নীতিগতভাবে স্বীকার করা হলেও সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে তা মানা হয় না। উদাহারণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার আদালতের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে, এক আদালতে দুইজন আসামীকে বিচারার্থে হাজির করা হয়। তন্মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, অপরজন শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গ আসামীটি একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ধর্ষণ করেছিল। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। আর শ্বেতাঙ্গ আসামীটি একজন কালো আদমীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে আগুনে পুড়ে মেরেছিল। বিচারে তার বিশ পাউন্ড জরিমানা হয় এবং তা মাসিক কিস্তিতে আদায়ের সুবিধা দেয়া হয়। সমসাময়িক বিচার ব্যবস্থার এটাও এক বাস্তবতা, যা ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কল্পনাও করা যায় না।[৬৪]

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় সবদেশে, সব যুগেই মানুষ তার মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আইন শাসন, ধর্ম সংস্কার, ইত্যাদির নামে ও বর্তমানে মানুষ মানুষে ভেদাভেদ, অন্যায়-অবিচার, জুলুম নির্যাতন চলছে। 'Survival is the fitest' এই আপ্ত বাক্যই মানব সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর দেখা গেছে। প্রাচীন ভারতে হিন্দু শাস্ত্রকার মনু জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করে সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের সুচনা করেছিলেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (খ্রী. পূ.৪২৭-৩৪৭) ন্যায়বিচারের ধারণা হলোঃ

"গণতন্ত্র বিভেদের জন্মদানকারী এমন একটি সরকার-ব্যবস্থা যা বিশৃংখলাও বাড়াবাড়িতে পূর্ণ এবং অসম প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সমতা বিধানের প্রয়াসী।"[৬৫] তিনি আরো বলেন, "আমি ঘোষনা করছি যে, ন্যায়বিচার শক্তিমানদের করায়ত্ব। দুনিয়ার সর্বত্র ন্যায়বিচারের কেবল একটি মূলনীতি রয়েছে এবং তা হচ্ছে শক্তিমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ।"[৬৬] অথচ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় আইনের চোখে সকলেই সমান। একজন ব্যক্তি যখন বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন তখন তিনি নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত ভাবে আলাহর আইন অনুযায়ী বিচার করবেন। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু আমরা দেখি বৃটিশ পেনাল কোড এ সম্রাট কোন ভুল করতে পারে না অতএব তার কোনও দন্ড বিধান করা যায় না (The soverign can do no wrong and is therefore not liable to punishment) বলে সম্রাটকে আইনের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী স্বয়ং খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে ন্যায়সংগত রায় প্রদানের বিচারকের কোনও বাধা নেই। সমসাময়িক অপরাপর বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের স্বাধীনতার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হলেও কার্যত তাঁরা শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত নন। উদাহরণ হিসেবে ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। দিল্লী হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি আগারওয়ালকে ইন্দিরা গান্ধী সরকার হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে সরিয়ে একজন সেসন্স জজ হিসেবে বদলী করেছিলেন। এর কারণ ছিল বিচারপতি আগারওয়াল বিভিন্ন ডিটেনশনের মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন।[৬৮]

বিচারকের রায় চূড়ান্ত হলে তা কার্যকর করতে কোন গড়িমসি করার সুযোগ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় নেই। বিচারকের আরোপিত দন্ড (হদ) মওকুফ করার ক্ষমতা স্বয়ং খলীফা বা রাষ্ট্র প্রধানের নেই। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে কোনও দন্ড মওকুফের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের মূল ভাষ্য নিম্নরূপঃ "কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বনা ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।"[৬৯] ইসলামী বিচার ব্যবস্থায়ই কেবল পরিপূর্ণ সুবিচার (Complete justice) সম্ভব। কারণ বিচারকের জবাবদিহিতা চূড়ান্তভাবে মহান প্রভু আল্লাহর নিকট। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Duty of the state)। মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিচার ব্যবস্থায় মানবীয় দুর্বলতার কারণে প্রকৃত সুবিচার বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একমাত্র ইসলামী বিচার ব্যবস্থায়ই প্রকৃত ইনসাফ নিশ্চিত হতে পারে।

উপসংহারঃ

বিচার ও ইনসাফ প্রতিটি মানুষের অতি স্বাভাবিক অধিকারে বিষয়। পানি, আলো ও বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন দেশের প্রতিটি মানুষই পেতে পারে এ অধিকার থেকে কেউ কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। তেমনি সুবিচারের প্রথম শর্ত মানুষের সমঅধিকারের ধারণার অনুপস্থিততে ইসলামী সমাজ ছাড়া আর সব সমাজেই মানুষে মানুষে বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহানবী (সাঃ) ই প্রথম মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে একটি আদর্শ বিচার ব্যবস্থা প্রচলন করেন, যাতে করে সকল নাগরিকের সম অধিকার নিশ্চিত ছিল। পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় তা বিস্তৃতি লাভ করে। তখন ন্যায় বিচারে যে নজীর স্থাপিত হয়েছিল গোটা মানব জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই। অথচ ইসলামী বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণে এবং অপরাধ ও শাস্তি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি না জানার কারণে কিছু সংখ্য ইউরোপীয় গ্রন্থকার ইসলামের বিধিবদ্ধ শাস্তিকে বর্বরোচিত ও মানহানিকর বলে মন্তব্য করে থাকে। ইসলামের কিছু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে আপাত দৃষ্টিতে অমানুষিক ও অশোভনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্ত করলেই দেখা যাবে যে, এই শাস্তি অমানুষিকও নয় এভং অশোভনীয়ও নয়। কেননা এই শাস্তির ব্যবস্থা ইসলাম ঠিক তখনই দেয় যখন এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অপরাধীর পেছনে বিন্দুমাত্রও কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না এবং তা করার পক্ষে কোন যুক্তিসংগত কারণও বর্তমান ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইসলাম চোরের হাত কাটার বিধান দেয়। কিন্তু যেখানে

সামান্য মাত্র সন্দেহ থাকবে যে একমাত্র ক্ষুধার কারণেই চুরি করতে বাধ্য হয়েছে সেখানে চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয় না। ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘ চারশ বছরের মধ্যে চুরির অপরাধে মাত্র ছ'জন লোকের হাত কাটা হয়েছে।[৭০] সুতরাং স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় চোরে হাত কাটা নয়, বরং উদ্দেশ্য হল চুরিকেই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। আর এ কারণেই ইসলাম শাস্তির পূর্বে অপরাধেকেই নির্মুল করার চেষ্টা করে। ইসলামী শাস্তি প্রবর্তনের যে ঘটনাগুলো আমরা দেখতে পাই তা সত্যিকার সুবিচার প্রতিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১ আল-কুরআনুল করীম, ১২ ঃ ৪০

২ আল-কুরআনুল করীম, ৩ ঃ ১৯

৩ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তায়ালা তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুক) আল কুরআনুল কারীমের সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের নির্দেশ ও ভাষ্যানুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম উচ্চারণ বা পঠনের সাথে সাথে এ দোয়া 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাল্লাম' পাঠ করা অত্যাবশ্যকীয়। আমরা প্রথমবার বিস্তৃতভাবে লিখে পরবর্তীকালে সংক্ষিপ্তরূপ 'সা.' লিখেছি। কিন্তু পড়ার সময় পূর্ণ দোয়াটাই পড়তে হবে।

৪ আল-কুরআনুল করীম, ৬ ঃ ৬২

৫ আল-কুরআনুল করীম, ৬ ঃ ৫৭

৬ আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ৪৮

৭ আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ৫৮

৮ আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ৮

৯ আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ৪২

১০ আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ১৩৫

১১ আল-কুরআনুল করীম, ৫৭ ঃ ২৫

১২ আল-কুরআনুল করীম, ৬ ঃ ১৫২

১৩ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ.২১৭

১৪ Dr. S A Q Husaini, Arab Administration, sixth edition, Lahore, 1970, p.23

১৫ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬ তে উদ্ধৃত

১৭ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, খোলাফায়ে রাশেদীন বা চার খলীফার জীবন ও কর্ম, মীনা বুক হাইজ, ঢকা, ২০০৩, পৃ. ৭৩-৭৪

১৮ হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনু কাসির, অনুবাদঃ ডঃমুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, তাফসিরে ইবনে কাসির ঢাকা, ২০০৩ইং, পৃ. ৬৭৪

১৯ আল-কুরআনুল করীম, ৪ঃ ১৭৬

২০ Al-Haj Mahomed Ullah, the Administration of Justice in Islam, Kitab Bhauam, New Dellhi, Third Edition 1990, p.5

২১ Dr. S A Q Husaini, Ibid, p.53

২২ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

২৩ আবদুল মওদুদ, হযরত ওমর, ষষ্ঠ প্রকাশনা, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১৪

২৪ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬-২১৭

২৫ শামসুল আলম, হযরত আলী (রাঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৪-১৫

২৬ A l-Haj Mahomed Ullah, Ibid, p.9

২৭ মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

২৮ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, অনুঃ আকরাম ফারুক, আল জিহাদ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৩ পৃ. ১৫০

২৯ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ইরান ব্যতিত অন্য কোন স্বার্থক ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। তবুও সৌদিআরব, পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিসম দেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৩০ মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃ. ২০-২২

৩১ আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ৫৯

৩২ আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ৮০

৩৩ আল-কুরআনুল করীম, ৫৯ ঃ ৭

৩৪ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আননিসাপুরী, সহীহুল মুসলিম, হুচ্চাতুন্নবী অধ্যায়, প্রথম খন্ড, পৃ.৩৯৭।

৩৫ আল-কুরআনুল করীম, ৪ ঃ ৫৯।

৩৬ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে আননিসাপুরী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ্ধ অধ্যায় পৃ.২৩১।

৩৭ মেশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ. ১০২

৩৮ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, কিতাবুল মাঘাযী অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪৩৯

৩৯ Mohammed S.El-Awa, Punishement in Islamic Law: A Comparative Study, Raby Printing Press, Dellhi, 1983, P-2

৪০ আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ৩৮

৪১ মুস্তফা আস সিবায়ী, অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, ইসলামী সভ্যতায় মানব প্রেম, (মাসিক পৃথিবী ঃ ঢাকা, মার্চ সংখ্যা, ১৯৯৯ইং), পৃ. ২৭

৪২ আল-কুরআনুল করীম, ৫ ঃ ৩৩

৪৩ Mohammed S.El-Awa, Ibid. Cit P.17

৪৪ আল-কুরআনুল করীম, ২৪ঃ২

৪৫ আল-কুরআনুল করীম, ২৪ঃ ৪

৪৬ আল-কুরআনুল করীম, ২ঃ ৪৩

৪৭ কাজী এবাদুল হক, বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৮

৪৮ আল-কুরআনুল করীম, ২ঃ ২৮২

৪৯ আল-কুরআনুল করীম, ২ঃ ২৮৩

৫০ আল-কুরআনুল করীম, ৪ঃ ১৩৫

৫১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদর রহীম, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, খায়রুন প্রখাশণী, ঢাক, পৃ. ২২৯

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৫৪ হেদায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৫৭-৬১

৫৫ ইমাম শাফেয়ী সহ অধিকাংশের মতে নারী ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারক হতে পারবেনা কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে পারবে। See Abdur Rahim, The Principle of Islamic Jurisprudence, New Delhi, 1911, p. 370

৫৬ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আহকাম, পৃ. ৭৮৬

৫৭ আইন রচনার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এতে অনেকে মনে করতে পারেন যে, সংসদে যে আইন রচনা করা হয় তার বৈধতা কি হবে?

উত্তর হলো সংসদের রচিত আইন কোন নতুন আইন নয়; বরং তা হবে আল্লাহর দেয়া আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে উদ্ভাবিত ব্যবস্থারই অংশ মাত্র।

৫৮ আল-কুরআনুল করীম, ১২ঃ ৪০

৫৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৬০ Shibli Numani, Umar the great, Vol-2, Lahore, 1957, p.62-63

৬১ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, পৃ. ১১৩,

৬২ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী প্রগুক্ত, পৃ. ১৫১

৬৩ দৈনিক সংগ্রাম, ৩০ আগস্ট, ২০০৫

৬৪ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৬৫ Morris Stockhammer, Plato Dictionary, Philosophical Library, New york 1903, p.56

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৬৮ মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রআজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, রিকো প্রৃন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৭

৬৯ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৪, (সংশোধিত) পৃ. ৩৫

৭০ মুহাম্মদ কতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নবম সংস্কারন, ১৯৯৭, পৃ. ২২২